এই সময়

*** কথাসরিৎ ***

একটি সুশাসিত দেশে দরিদ্র হলে লজ্জিত হতে হয়।
কুশাসিত দেশে লজ্জিত হতে হয় সম্পদ থাকলে।

— কনফুসিয়াস

শুভচিহ্ন

প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করার পথে বহু দূর অগ্রসর হলেন ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয় ইউনিয়ন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলির কূটনীতিকরা। দীর্ঘ আলোচনার পর ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তির প্রথম খসড়াটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। পশ্চিমি দুনিয়ার পক্ষে এই আলোচনার নেতৃত্ব দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবং সেটিই ছিল এই চুক্তির পথে সব থেকে কঠিন অন্তরায়। ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের পর থেকে আজ পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যে কোনও সরকারি কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। বস্তুত বারাক ওবামার দুই পূর্ববর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন এবং জর্জ বুশ-এর আমলে সম্পর্কের এই তিক্ততা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির উদ্যোগে ২০১৩ সালে ৩৪ বছরের মধ্যে প্রথম দু'দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই প্রেক্ষিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোনও পক্ষের সঙ্গে ইরানের পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে দু'পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করা যে কতটা কঠিন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই এই সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই ধন্যবাদার্হ। শেষ পর্যন্ত এই চুক্তিটি চূড়ান্ত রূপ পেলে তা ইরান-মার্কিন সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই চুক্তির ফলে যদি ইরানের বিরুদ্ধে পশ্চিমি দেশগুলির অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়ে ইরানের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় তা হলে পশ্চিম এশিয়ার সার্বিক ভূ-রাজনৈতিক ছবিটিও আমূল বদলে যেতে পারে।

কিন্তু ঠোঁট ও কাপের মধ্যের বহু কথিত ফাঁকের মতোই এই চুক্তিটির খসড়া তৈরি ও তার চূড়ান্ত রূপে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের স্বাক্ষরের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। কঠোর বাস্তব এটাই যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠী এই চুক্তির বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর। এই বিরোধীদের মধ্যে সব থেকে প্রভাবশালী অবশ্যই মার্কিন রিপাবলিকান পার্টি। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ভাবে তাঁরা এই চুক্তির বিরোধী। তাঁদের বিরোধিতার মুখে ওবামা কী ভাবে এই চুক্তি সইয়ের ক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেসকে রাজি করাতে পারেন তা ভবিষ্যতই বলবে। সেটি বাধ্যতামূলক না হলেও জরুরি। একই ভাবে রুহানির সামনে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ নিজের দেশের কট্টরপন্থীদের সমালোচনার মুখে এই চুক্তির বিষয়ে দেশের নাগরিকদের সমর্থন আদায় করা। এ ছাড়াও সৌদি আরব এবং ইজরায়েল দু'টি দেশই এই চুক্তির বিরোধী। তবু চুক্তিটির খসড়া ও চূড়ান্ত রূপের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর হলেও দুস্তর নয়। এটির সাফল্যের জন্য বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, সৌভাগ্যবশত এ পর্যন্ত তার ঘাটতি দেখা যায়নি। ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহু হাজার বছরের। আধুনিক কালে এ দেশ অপরিশোধিত তেলের জন্য ইরানের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। উন্নত, অবরোধমুক্ত ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তৃত করা ভারতের পক্ষেও সহজতর হবে। যত দ্রুত তা সম্ভব হয় ততই মঙ্গল।

গাণিতিক?

শোনা যাচ্ছে প্রেম যত না কলঙ্কভাগী, তার থেকেও বেশি অঙ্কভাগী। অর্থাৎ, আঁক কষেই বলে দেওয়া যাচ্ছে প্রেম ও দাম্পত্যের ভবিষ্যৎ পথটি। পথ শেষ না হলে কেমন হত বা দু'জনার দু'টি পথ দু'দিকে বেঁকে যাবে কিনা, তা নিয়ে দ্বিধাশঙ্কিত চিত্তে পথ চেয়ে আর কাল গুনে অপেক্ষা করার আর দরকার নেই, মোটামুটি ভাবে গণিতের ছকেই বাঁধা আছে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর। এই রকমটিই জানিয়েছেন গণিতজ্ঞ হানা ফ্রাই তাঁর 'দ্য ম্যাথমেটিক্স অফ লাভ: প্যাটার্ন, প্রুফস অ্যান্ড দ্য সার্চ ফর দ্য আলটিমেট কোয়েশ্চেন' বইটিতে। তাঁর মতে প্রেমের ছকটি জটিল হতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণত দুর্বোধ্য নয়। মদনবাণবিদ্ধ যৌবনের জন্য কয়েকটি ছকও তিনি বাতলেছেন। যেমন, ফেসবুক প্রোফাইলে আকর্ষণীয় স্ব-চিত্র সাঁটলেই যে সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে এমনটি নয়। অথবা, প্রথমেই যাকে ভালো লাগে তাকেই জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিলে আখেরে পস্তাতে হতে পারে। এই সুপরামর্শাবলীর পিছনে যৌক্তিক গণনাপদ্ধতি আছে নিশ্চয়, কিন্তু গোল বাঁধে এই 'যুক্তি' শব্দটাকে নিয়েই। কারণ, গাণিতিক যুক্তি যখনই একটি ছক খোঁজে, সেই খোঁজ চলে অতীতের তথ্যের উপর ভিত্তি করে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ যা ঘটেনি তার হদিস মিলবেই বা কোন উপায়ে? অতএব, অতীতের মধ্যেই ভবিষ্যতের উত্তর খোঁজা জারি থাকে। শুধু অতীতের মধ্যেই নয়, অতীতের এমন ঘটনার মধ্যে যা 'সাধারণত' হয়ে থাকে। অর্থাৎ, অতীতের বিস্তর ঘটনা ও তথ্য বিশ্লেষণ করেই স্থির করা যেতে পারে কিংকর্তব্য। এমনকী প্রেমের ক্ষেত্রেও।

গাণিতিক এহেন দর্শনের বিপ্রতীপ একটি মতের সপক্ষে একটি মোরগের কাহিনি শুনিয়েছিলেন চিন্তাবিদ নাসিম তালেব। যে মোরগটির খামারে বিনা আয়াসের খাবার পেয়ে স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ঘটছিল নিরন্তর। ইতিহাস তাকে শিখিয়েছিল যে এই ভাবেই কাটবে বাকি জীবন। ধড় ও মুণ্ড পৃথক করার জন্যই যে এই তোয়াজ, সেই শিক্ষা ইতিহাস থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। অতএব, দর্শনটি প্রশ্নাতীত নয়। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে গাণিতিক প্রতিপাদ্যটি প্রশ্নের উর্ধ্বে, তবুও সব প্রশ্নের নিরসন হয় কি? মানুষকে ইতিহাস মাফিক এক ছকে বেঁধে ফেলতে পারলে তত্ত্ব নির্মাণে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তিমানুষের জীবন তার ফলে কতটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেটি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কিন্তু থেকেই যায়। এমনিতেই আপাতত বাঁধাধরা ছকের মধ্যেই মানুষের জীবন যাপন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য মেড ইজি গোছের সন্দর্ভকে মান্য করাতেই মোক্ষ লাভ, সাফল্য লাভ তো বটেই। অন্তত সে রকমই নাগরিক সভ্যতা নামক অরণ্যের প্রবাদ। তার মধ্যেও চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত হওয়ার যেটুকু অবসর মিলত, সেটুকুকেও অঙ্কের আঁটোসাঁটো গণ্ডিতে আটকে ফেললে সফলতা হয়তো মেলে, কিন্তু আনন্দ মেলে কি? পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা নিয়েই যে কারবার, তাকে হিসেবের খাতায় বন্দি করতে চাইবেই বা কে?

*** অসংখ্যা ***

১১২০০০

(এক লক্ষ বারো হাজার)— টাকা প্রতি কিলো দরে বিক্রি হয় সব থেকে দামি দার্জিলিং চা, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

*** দিনকেদিন ***

৭ এপ্রিল

১৭৭০: উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৯৫: কালীচরণ মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
১৯২০: সেতারবাদক রবিশঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৪৮: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' (WHO) প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০০১: 'নাসা' মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে 'মার্স ওডেসি' প্রেরণ করে।

চা-শিল্পের শ্রমিকদের আরও এক বার স্বপ্নভঙ্গ

বহু আন্দোলনের পরে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ল সামান্য। তা মেনেও নিল ট্রেড ইউনিয়নগুলো। এবং শ্রমিকদেরও তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। লিখছেন **অনুরাধা তলোয়ার**

বহু ঢক্কা নিনাদ, হুমকি-পাল্টা হুমকি, হাতা গোটানো, প্রতীকী ভুখ হরতালের পর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সুড়সুড় করে মেনে নিল যে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৩৭ টাকা ৫০ পয়সা বাড়িয়ে করা হবে ১৩২ টাকা ৫০ পয়সা। তা-ও আবার এই বর্ধিত মজুরি শ্রমিকেরা পাবেন ২০১৭ সালে! এই যৎসামান্য বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রথম রাখেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী। কাজেই মা-মাটি-মানুষের সরকার এই সিদ্ধান্তে জোর হাততালি দিচ্ছে। চা বাগানগুলি থেকে যতটা সম্ভব মুনাফা নিঙড়ে নেওয়ায় উদগ্রীব মালিকপক্ষ খুশি হয়ে এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।

গোটা প্রেক্ষিতটা একটু ভেঙে বলা দরকার। চা শিল্প পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম শিল্পগুলির অন্যতম। প্রতি তিন বছর অন্তর ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ঠিক করা হয়। এই তিনটি পক্ষ হল — মালিক, সরকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন। এই তিন পক্ষের প্রতিনিধিরা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন। এখানে এই গোটা প্রক্রিয়াটির একটি অদ্ভুত দিক বলে রাখা ভালো। চা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ৭০ শতাংশই মহিলা। কিন্তু এই সব আলোচনায় কোনও মহিলাকে অংশ নিতে প্রায় কখনওই দেখা যায় না। জনগোষ্ঠীর বিচারে শ্রমিকদের প্রধান অংশই দুশো বছর আগে ছোটোনাগপুর থেকে নিয়ে আসা আদিবাসীদের উত্তরসূরি। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তাঁদেরও এই আলোচনায় অংশ নিতে দেখা যেত না। ইদানীং কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। তা হলে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় কারা থাকেন? সরকার ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির আদিবাসী নন এমন সব পুরুষবাবুরা। কাজেই যে শিল্পের শ্রমিকদের ৭০ শতাংশই আদিবাসী মহিলা সেখানে দৈনিক মজুরি যৎসামান্য বাড়ানোর ব্যাপারে এই তিন পক্ষের মধ্যে একটা মোটামুটি ঐকমত্য থাকবে, তা কি খুব অবাক হওয়ার বিষয়? নাকি এই সব চুক্তিকে 'মন্দের ভালো' বলে অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন যে নিজেদের পিঠ চাপড়াবে সেটা খুব অস্বাভাবিক? তাঁদের খুব পছন্দের বুলি হল — গ্লাসটাকে অর্ধেক ভর্তি তো করা গেল! তাঁরা ভুলে যান এর আর একটা অর্থ গ্লাস অর্ধেক খালি থেকে গেল আর শ্রমিকরা আধপেটা।

এ বছরের চুক্তির পরেও শ্রমিকরা সেই আধপেটাই থেকে গেলেন। ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী, চা শিল্পের শ্রমিকদের জন্য একটা দৈনিক মজুরি ঠিক করে দিতে সরকার বাধ্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি সব থেকে কম— দৈনিক ২০৬ টাকা। ফেব্রুয়ারির চুক্তির পরে প্রথম বছরে চা শ্রমিকরা কত পাচ্ছেন? ১১২ টাকা ৫০ পয়সা। এটা কী করে হয়? সরকারি ন্যূনতম মজুরি এখানে প্রযোজ্য হচ্ছে না কেন? চল্লিশ বছর আগে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ মিলে ঠিক করেছিলেন, সরকারি ন্যূনতম মজুরি যথেষ্ট নয়, তার থেকে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য মজুরি ঠিক করে নেওয়াই ভালো। চল্লিশ বছর আগে সত্যিই তাই ছিল। কিন্তু তার পরে যে দুনিয়াটা বদলে গিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। কমেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দর কষাকষি করার ক্ষমতা। ২০০৫ সাল থেকে পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটেছে। সে বছরের চুক্তিতে তিন বছরে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো হয় ৮ টাকা। সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, অতঃপর উৎপাদনের সঙ্গে মজুরিকে যুক্ত করা হল। আর এই চুক্তি হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা ১৫ দিনের ধর্মঘটের পর। বহু শ্রমিক ওই ১৫ দিনের মজুরি পর্যন্ত পেলেন না। সেই ধারা বজায় রেখেই ২০০৮ সালে মজুরি বাড়ানো হল তিন বছরে ১৪ টাকা। ২০১১-য় তিন বছরে ২৮ টাকা বেড়ে ২০১৪ সালে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি দাঁড়ালো ৯৫ টাকায়। এ দিকে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ অব্যাহত। কাজেই শ্রমিকদের যা প্রয়োজন এবং যা তাঁরা পেয়ে থাকেন, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে দাঁড়ালো আকাশ-পাতাল। ২০০৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে চা বাগানগুলিতে ব্যাপক সংখ্যায় অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে থাকল। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেল, যে সব বাগান রমরমিয়ে চলছে সেখানেও বহু শ্রমিক অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার।

> চা শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করতে একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। 'যত শীঘ্র সম্ভব' এই কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। এ ছাড়া সে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কোনও সময়সীমা এই চুক্তিতে নেই।

এই বছরগুলিতে শ্রমিকদের দেওয়া আরও বহু প্রতিশ্রুতিই কাগজে কলমে থেকে গেল। দীর্ঘ ৩৩ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ২০১০ সালের অগস্ট মাসে সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার গেজেট নোটিফিকেশন করে চা শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরির খসড়া তৈরির কথা ঘোষণা করল বটে কিন্তু তা নিয়ে সরকার আর কোনও পদক্ষেপ করল না। ২০১১ সালের মে মাসে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হল। চা শিল্পে সরকারি ন্যূনতম মজুরির সেই পরিকল্পনা খসড়া প্রস্তাব হয়েই থেকে গেল। ২০১১ সালে শ্রমিকদের লিখিত ভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব মাথায় রেখে তাঁদের পরিবর্তনীয় মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে। আজও মালিক পক্ষ সে কথা রাখেননি। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও এই প্রতিশ্রুতি পালনে মালিকদের বাধ্য করতে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এই ভাবেই মজুরির যৎসামান্য বৃদ্ধি, না-রাখা প্রতিশ্রুতি আর সরকারি ন্যূনতম মজুরি লাগু করার একটি খসড়ার ঘোষণার প্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত হল এ বছরের চুক্তি।

কেন এই পরিস্থিতি চলছে? ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রীদের যুক্তি হল — চা শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করতে একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। 'যত শীঘ্র সম্ভব' এই কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। এ ছাড়া সে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কোনও সময়সীমা এই চুক্তিতে নেই। সে রিপোর্ট কি রাজ্য সরকার মানবে? তেমন বাধ্যতামূলক কোনও কথাও বলা নেই এই চুক্তিতে। চা শিল্পের ইতিহাস, না-রাখা-প্রতিশ্রুতির ইতিহাস। শ্রমিকদের অনেকেই মনে করছেন তাঁরা ফের প্রতারিত হলেন।

মালিকপক্ষের যুক্তি কী? সহজ — চা শিল্পে মুনাফা দিনে দিনে কমছে। কিন্তু কতটা সত্যি এই দাবি? চা শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের মূল লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ বাজার। উৎপাদনের ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ সেখানেই বিক্রি হয়। কাজেই বিশ্ববাজারের মন্দার ফলে তার উপর খুব প্রভাব পড়েছে এমনটা বলা যাচ্ছে না। বরং আমরা দেখছি, একুশ শতকের প্রথম দশকে কিছু ধাক্কার পর থেকে চা শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে। বেড়েছে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও। মালিক পক্ষের বক্তব্য, মুনাফা কমার কারণ শ্রমিকদের মজুরি ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি। একটি চা-বাগানের (কারখানা চালানোর খরচ সহ) যা খরচ, তার প্রায় অর্ধেক খরচ হয় মজুরিতে। আবার এই মজুরির মধ্যে ৫৫ থেকে ৭৫ শতাংশ যায় চা পাতা তোলার মজুরি দিতে। কাজেই খরচে লাগাম পরাতে মালিকরা শ্রমিকদের বস্তুত দিন-আনি-দিন-খাই মজুরিটুকুই দিয়ে থাকেন।

মজুরি এত সামান্য হওয়ায় শ্রমিকরা ঢালাও কামাই করা শুরু করেছেন। কিছু কিছু বাগানে গেলে দেখা যাবে সেখানের সব পুরুষ অধিকতর মজুরির আশায় কেরালা, তামিলনাড়ু এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছেন। কাজেই রাতের ডিউটি, বাগানের কারখানার কাজের মতো যে সব কাজ সাধারণত এতকাল পুরুষরা করে এসেছেন, সেগুলি এখন মহিলাদের করতে হচ্ছে। প্রত্যেক পরিবারই চেষ্টা করে পরিবারের এক জন যেন বাগানে কাজ করে। কারণ, তা না হলে তাঁদের বাড়ির উপর তাঁদের কোনও আইনি দাবি থাকবে না।

যদিও বিগত দেড়শো-দু'শো বছর ধরে তাঁরা পুরুষানুক্রমে সেখানেই থেকে এসেছেন। বাড়ির উপর আইনি অধিকার বাগান কর্তৃপক্ষের। পরিবারের কোনও সদস্যই বাগানে কাজ না করলে, পরিবারকে ঘরছাড়া করা হবে। কাজেই মজুরি যতই কম হোক না কেন পরিবারের কেউ না কেউ বাগানের কাজে থেকে যান। ঘরছাড়া হলে তাঁরা কোথায় যাবেন? একবিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথার কী আশ্চর্য প্রয়োগ — মাইনের কথা ভেবো না, মাথার উপর ছাদটা রাখতে হলে, কাজ করে যাও। এ রাজ্যে চা শিল্পে সরাসরি নিযুক্ত তিন লক্ষ শ্রমিক। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলার অর্থনীতি চা শিল্পের উপর গভীর ভাবে নির্ভরশীল। এমন একটি শিল্পকে সুস্থ ভাবে সচল রাখার দায়িত্ব কী সরকারের উপরও বর্তায় না? বর্তায় বলেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উচিত গোটা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে শিল্পটিকে চাঙ্গা রাখে। কী ভাবে সেটা সম্ভব? মালিকদের অধিকতর ভরতুকি দিয়ে হতে পারে। কিংবা শ্রমিকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির অধিকতর সুযোগ সুবিধা দিয়ে হতে পারে। গণতন্ত্রে তো সরকারের একটা বড়ো দায়িত্ব কোনও গ্লাস বা কোনও পেটই অর্ধেক ভর্তি না হয়ে থাকে তা সুনিশ্চিত করা, তাই নয় কি?

লেখক সমাজকর্মী

কতকথা

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভালো নয়, তা নয়। সেটা সুনিশ্চিত করা সম্ভব না। এক জনের হাত চালানোর স্বাধীনতা অন্যের নাক না ভেঙে বাঁচার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে।

কৌশিক বসু
বল্গাহীন স্বাধীনতার সমস্যা প্রসঙ্গে।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি — চিরকাল আমি এটা করার কথা ভেবেছি। এ আমার ছেলেবেলার স্বপ্ন। এ নিয়ে বহু ভেবেছি। এমনকী মনে মনে পরিকল্পনাও করে রেখেছি। কিন্তু করে ওঠা হয়নি!

ইমরান হাসমি
তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছা প্রসঙ্গে।

চ্যালেঞ্জ করছি — কংগ্রেস সভাপতি ভারতের যে কোনও গ্রামের যে কোনও ক্ষেতে খামারে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে দেখিয়ে দিন কোন শস্যটা ধান আর কোনটা গম। পারবেন না।

সুখবির সিং বাদল
পাঞ্জাবের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সনিয়া গান্ধীর গ্রাম সম্পর্কে অজ্ঞতার অভিযোগ তুলে।

আজকাল কোনও ব্যাটসম্যান হাফ সেঞ্চুরি বা সেঞ্চুরি করলে ফিল্ডিং দলের কেউ হাততালি পর্যন্ত দেয় না। যদি কেউ দেয়, তাকে 'সিসি' বলে হেয় করা হয়।

সুনীল গাভাসকর
ইদানীং খেলোয়াড়ি মনোভাবের অভাব প্রসঙ্গে।

বিরোধীদের অবস্থা খুবই হতাশাজনক। অর্থহীন কিছু ইস্যু খুঁজে বের করার থেকে তাঁদের উচিত তাঁদের লুকিয়ে থাকা নেতাকে খুঁজে বের করা।

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সনিয়া গান্ধীকে নিয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে।

'স্বাধীন নয় মানুষ হতে চাওয়া মানুষগুলো...'

সদ্য নিহত ওয়াশিকুর রহমানের লেখা একটি পংক্তি। বাংলাদেশে উপর্যুপরি হত্যাকাণ্ডের নিরিখে প্রাসঙ্গিক। আর ভারতের ক্ষেত্রে? লিখছেন **মইদুল ইসলাম**। শেষ পর্ব

পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদ যেমন মৌলবাদীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিল আবার কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি কর্তৃত্ববাদী হয়ে গিয়ে জনসমর্থন হারিয়ে দুর্বলও হয়েছিল। মুসলিম বিশ্বে ওই কর্তৃত্বপরায়ণ ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে মৌলবাদ তার রাজনৈতিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সেনা অফিসাররা মিলে হত্যা করার পরে জিয়াউর রহমান ও হুসেন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে দুটো সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সামরিক শাসনকালে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর উপর মুজিব রহমানের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ওঠে এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ ক্রমেই 'ইসলামি' বাংলাদেশে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। কিন্তু গত সাত আট বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কিছুটা বদলে যায়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল ও উদার রাজনৈতিক দলগুলোর জোট বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পরে ধর্মনিরপেক্ষ দাবিগুলো আবার জোরদার হয়। ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিরই ধারক বাহক হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় যুদ্ধপরাধের জন্য কিছু মৌলবাদীদের ফাঁসির হুকুম হয় তো কারও আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়। উপরন্তু প্রধান বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি এবং মৌলবাদী শক্তিগুলো সাংগঠনিক কোণঠাসা অবস্থায় ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করে। আর বিরোধীশূন্য অবস্থায় আওয়ামি লিগ ফাঁকা মাঠে গোল দেয়। এই রকম একটা সন্ধিক্ষণে মৌলবাদীরা আরও বিচলিত হয়ে পড়ছে, ধর্ম সম্পর্কে যে কোনও মৌখিক আক্রমণকেই তারা নাস্তিকতার প্রচার বলে মনে করছে। যথারীতি, নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তারা যুক্তিবাদী ও তার্কিক আদান প্রদান না করে মানুষ খুন করছে। বাংলাদেশের জনতা কিন্তু ভোটের বাক্সে মৌলবাদীদের খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না। যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের আক্রমণ করে মৌলবাদীরা বড়োজোর রাজনৈতিক ময়দানে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু গ্রাম-মফস্সলের সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে তারা বেশ বেগ পায়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েক জন ছাত্র মারা যান। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমেদ, আবুল বরকত এবং আবদুল জব্বর। তাঁরা বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ভাষা উর্দু চাপানোর প্রতিবাদ করেছিলেন। সে দিন তাঁদের কাছে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদার শুধু প্রশ্ন ছিল না বরং বাংলা ভাষা অবলম্বন করে শিক্ষা ও সরকারি চাকরি পেয়ে এক সুন্দর সুরক্ষিত ভবিষ্যতের প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই সুরক্ষিত ভবিষ্যতের আশা বুকে নিয়ে এক কর্তৃত্ববাদী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য সে দিন তারা বুক চিতিয়ে প্রতিবাদী স্লোগান দিলেও, বুকে পুলিশের গুলি খেতে হয়েছিল। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বরের মতো খাঁটি বাঙালি ভাইদের সেদিনকার জীবনত্যাগ আজ আবার মনে করিয়ে দেয় আহমেদ রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমানদের মতো এই প্রজন্মের বাঙালি ভাইদের মৃত্যু। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আজ বাংলাদেশে, জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বাঙালিকে হত্যা করছে ধর্মীয় কট্টরপন্থী মৌলবাদী 'বাংলা ভাই' (সিদ্দিকুল ইসলাম)-এর মতাদর্শে দীক্ষিত কিছু যুবক। এটা হয়তো ইতিহাসের পরিহাস যে বাংলাদেশের ভিত্তি ছিল ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয়।

এএফপি

বাংলাদেশে যেমন ধর্মীয় মৌলবাদীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হচ্ছে বা আমৃত্যু কারাদণ্ডে পচানো হচ্ছে, আমাদের 'মহান' 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারত রাষ্ট্রে যে সব আরএসএস কর্মীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ ও নান্দেদ, মালেগাঁও, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনায় অভিযুক্ত, তাদের সকলকে ও রকম কঠিন শাস্তি দিতে কোনও দিন পারব? বাংলাদেশে ধর্মের নামে রাজনীতি করা দল, জামাত-এ-ইসলামি বারো শতাংশের বেশি কোনও দিন ভোট পায়নি, সেখানে থাকা মুসলিম সংখ্যাগুরু মানুষের সমর্থন তো দূর কথা। বাংলাদেশ সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত, জামাত কোনও দিন তিনশোর মধ্যে আঠারোটার বেশি আসন পায়নি। অথচ আমাদের 'মেরা ভারত মহান' স্লোগান তোলা 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে' ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের নামে শুধু ৩১ শতাংশ মানুষের সমর্থনই জোটে না, বরং সংখ্যাগুরু আসন পেয়ে এমন এক জন প্রধানমন্ত্রী হয় যিনি ২০১৩ সালেও এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, সংখ্যালঘু মানুষকে 'কুকুর শিশুর' সঙ্গে তুলনা করতে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হন না। তবে বাংলাদেশে যে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে এমন নয়। ওখানে চট্টগ্রামের আদিবাসীরা, বিহারিরা এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের একাংশ প্রান্তিক জীবনযাপন করছে, বেশ কিছু অভাব অভিযোগ নিয়ে। সেটা বাংলাদেশের কাছে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়। তাই শাহবাগের মতো মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ জোরদার আন্দোলন করে, তাদেরকে বাংলাদেশের আদিবাসী, বিহারি ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে নিয়েও আন্দোলন করা উচিত।

> চার দশক আগে বাংলাদেশ শুধু নতুন একটা আশ্রয়ের সন্ধান করছিল না। স্বাধীনতার সন্ধানও করছিল। রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমানদের মৃত্যু প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ আজও প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান করছে।

ওয়াশিকুর মারা যাওয়ার পর এক ব্লগের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত ২৬ মার্চ, বাংলাদেশের পঁয়তাল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ওয়াশিকুর লিখেছিলেন, 'আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস' নামের এক কবিতা। ওয়াশিকুর লিখেছিলেন,

'মোল্লা স্বাধীন, জঙ্গি স্বাধীন, ছাগু স্বাধীন, মুমিন স্বাধীন, দুর্নীতিবাজ স্বাধীন, রাজনৈতিক নেতা স্বাধীন, পাতি নেতা স্বাধীন, ধর্ষক স্বাধীন, সামরিক বাহিনী স্বাধীন, সুশীল সমাজ স্বাধীন, পিনাকী স্বাধীন, শফি হুজুর স্বাধীন, দলদাস স্বাধীন, গার্মেন্টস মালিক স্বাধীন, লঞ্চ মালিক স্বাধীন...

স্বাধীন নয় কৃষক-শ্রমিক,
স্বাধীন নয় কথিত সংখ্যালঘু-আদিবাসী,
স্বাধীন নয় মুক্তচিন্তার মানুষ,
স্বাধীন নয় মানুষ হতে চাওয়া মানুষগুলো...'

১৯৭৪ সালে, ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' নামক শেষ ছবিতে বলেছিলেন, 'আশ্রয়ের সন্ধানে আর একটা নীড় হারা পাখি, যে পাখির নাম—বাংলাদেশ'। চার দশক আগে বাংলাদেশ শুধু পৃথিবীতে নতুন একটা আশ্রয় বা জায়গার সন্ধান করছিল না। একই সঙ্গে স্বাধীনতার সন্ধানও করছিল। বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের সেদিনকার প্রেক্ষিতে আশ্রয় আর স্বাধীনতা সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছিল। সময় গড়ালেও রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমানদের মৃত্যু আবার প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ আজও প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান করছে। আর সেই স্বাধীনতার স্বাদ পেতে নবীন বাঙালি যেমন আগেও রক্ত দিতে কাপুরুষতা করেনি, তেমন আজও সে ভীত নয়। আগেও যেমন স্বাধীনচেতা মননকে মৌলবাদীরা দমাতে পারেনি, আজও কয়েকটা কাপুরুষোচিত খুন করে বাঙালী জাতীয়তাবাদী তথা ধর্মনিরপেক্ষ স্পৃহাকে সে দমাতে পারবে না। রাজীব হায়দার, অভিজিত রায় ও ওয়াশিকুর রহমানদের মৃত্যু মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার নতুন সম্ভাবনার দিকও খুলে দিতে পারে। এক দিনে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে হার জিতের ফয়সালা হবে না কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রাম একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প।

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়— প্রতি সম্পাদক, এই সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, নবম তল, ৪১ এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৭। ফ্যাক্স: ০৩৩-৬৬০৩১৩৭৮। ই-মেল: eisamay@timesgroup.com

নিজের মত জানান ফেসবুক-এ। লগ ইন করুন: www.facebook.com/eisamay.com

আমাদের G+-এ ফলো করুন: google.com/+EisamayOfficial